এমিলাইন প্যাঙ্‌খুর্স্ট

এমিলি ফিশেল

চিত্রণঃ মার্টিন রেম্‌ফ্রি

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



এমিলিন প্যাঙ্খুর্স্ট

যখন এমিলি জন্মেছিলেন তখন লোকে সন্তান মেয়ে সন্তানের থেকে ছেলে সন্তান বেশী চাইত। সবারই মনে হত মেয়ে সন্তান বড় হয়ে কিছু করতে পারবে না।



সবাই মনে করত, ছেলেদের সবকিছু শিখতে হয়। মেয়েদের সবকিছু জানার দরকারই হয় না। কারন ছেলেরাই তো সবকিছু চালনা করে।

কিন্তু এমিলাইন এসব ধ্যান ধারনা পাল্টাতে চাইলেন।

ছোট বেলাটা এমিলাইনের খুবই ভালো কেটেছিল।

তার মা বাবা খুবই ধনী আর দয়ালু ও ছিলেন। তাঁরা দীন দুঃখী মানুষদের সাহায্যের জন্য সর্বদা এগিয়ে যেতেন। কখনো কখনো এমিলাইনও তাঁদের সাথে যেতেন।



খুব শিগগিরিই তিনি কঠিন বাস্তবের সম্মুখিন হলেন, ধনী বাড়ির মেয়ে হলেও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না।

তাঁর পাঁচ ভাই একেকজন বড় হয়ে ডাক্তার, উকিল, অথবা অন্য কোনো অভিনব কাজ বেছে নিলেন।



কিন্তু তিনি আর তাঁর চার বোন বাড়িতেই রইলেন। সুপাত্রের সাথে বিয়ে হবার অপেক্ষায়।

১৪ বছর বয়সে এমিলাইন তাঁর মায়ের সাথে এক সাক্ষাতকারে গেলেন। সেটাকে বলা যেতে পারে “নির্বাচন” বিষয়ক সাক্ষাতকার।

মানুষেরা নির্বাচন করে তাদের প্রতিনিধি বাছবেন যিনি তাদের দেশ চালাবেন আর আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। কিন্তু ছেলেদের নির্বাচনের অধিকার ছিল, মেয়েদের না।



মিটিঙে এমিলাইন খুব শক্ত হয়ে বললেন, “নিয়ম কানুন সব পুরুষদের বানানো, তাই সবসময় তা মহিলাদের বিপক্ষে। মহিলাদের ভোটের অধিকার দিতে হবে! দেশের আইন কানুন বানানোতে তাদেরও বক্তব্য থাকা উচিৎ।“



এমিলাইনের মাতা পিতা তাঁকে সমসাময়িক অন্য মেয়েদের তুলনায় অনেক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন, তার কারণ এমিলাইন পড়তে আগ্রহী ছিলেন।

তখন মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান বেশী ছিল না। এমিলাইন তাই ফ্রান্স গেছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য।



কিন্তু যখন তিনি দেশে ফিরলেন, তিনি জানতেন না কি করবেন।

তখন তাঁর পরিচয় হল রিচার্ড মার্ডসেন পাঙ্খুর্স্টের সাথে......



আর রিচার্ড পাঙ্খুর্স্টকে বিয়ে করলেন যখন তাঁর বয়স ২১। আর রিচার্ডের ৪০।

রিচার্ড একজন খুব ভাল উকিল ছিলেন কিন্তু তিনি বেশী পয়সা করতে পারেন নি। তিনি সবসময় দুঃস্থদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন।

এমিলাইন তাঁকে বললেন, "রাজনীতিবিদ হও। তাহলে অনেক কিছু বদল আনতে পারবে।"



কিন্তু সেই সময় অনেকেই তাঁর এই দাবী অন্যায্যকর মনে করেছিল আর তাঁকে ভোট দেয় নি।

এই বিষয় নিয়ে এমিলাইন ও তাঁর বাবার মধ্যেও বচসা হয়। তাঁর বাবা এর পর তাঁদের সাথে কথাবার্তাও বন্ধ করে দেন।



ততদিনে এমিলাইন আর রিচার্ডের চারটি বাচ্চা হয়ে গেছে। তাঁরা একটা প্ল্যান করলেন।

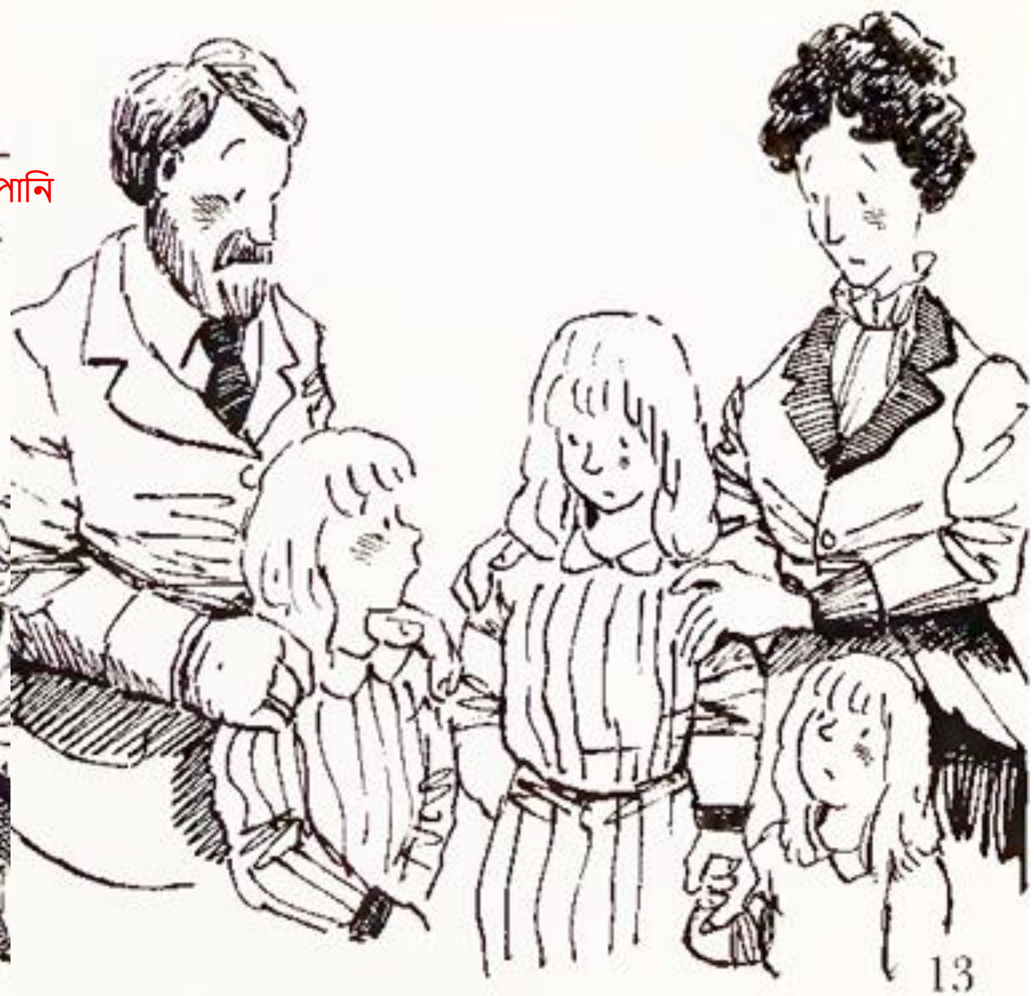
এমিলাইন বললেন, “চল, আমরা লন্ডন যাই আর ওখানে গিয়ে একটা দোকান খুলি। তাহলে আমরা অনেক আয় করতে পারব।“

কিন্তু তাঁরা যেসব জিনিস দোকানে রাখতেন, লন্ডনের ঐপাশটায় তার উপযুক্ত খদ্দের ছিল না।



সেই সময় তাঁদের বড় ছেলে ফ্রাঙ্ক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর কিছুদিনের মধ্যে সে মারা গেল।

ডাক্তার বললেন, "নোংরা রাস্তাঘাট, নোংরা ড্রেন- তবু ভাগ্য ভাল যে একটা মাত্র ছেলে মরেছে! এখানে সবসময় গরীবের ঘরের ছেলেরাই মরে!”



এক কনকনে শীতের দিনে তাঁরা ম্যাঞ্চেস্টার ফিরে এলেন। এমিলাইন হাড়ে হাড়ে টের পেলেন গরীবের জীবন কত দুঃসহ। অনেকেই কাজের জায়গাতেই কোনোমতে থাকতেন। আর সে জায়গা অত্যন্ত নোংরা ও আস্বাস্থ্যকর ছিল।



অনেক মানুষই না খেতে পেয়ে মরে গেলেও ঐসব জায়গায় যেতে চাইতেন না। আর যাঁদের তাদের কথা ভাবা উচিৎ সেই রাজনীতিবিদ রাও এদের জীবন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। তাই পাঙ্খুর্স্ট রুখে দাঁড়ালেন।



এমিলাইন বললেন, “ধনীদের অনেক আছে। আর গরীবরা পুরোপুরি বঞ্চিত। একমাত্র মহিলা ক্ষমতাধারীরাই পারবে এই দুর্দশা থেকে তাদের মুক্ত করতে। “

এমিলাইনের তখন ৩০ বছর বয়স, তিনি তয়াঁর এক স্কুলের বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছিলেন ফ্রান্সে। সেখানেই হঠাৎ খবর আসে রিচার্ডের শরীর খারাপ, সেই শুনে তিনি তড়িঘড়ি ঘরে ফিরে আসেন।



তাঁর ফেরার আগেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়।

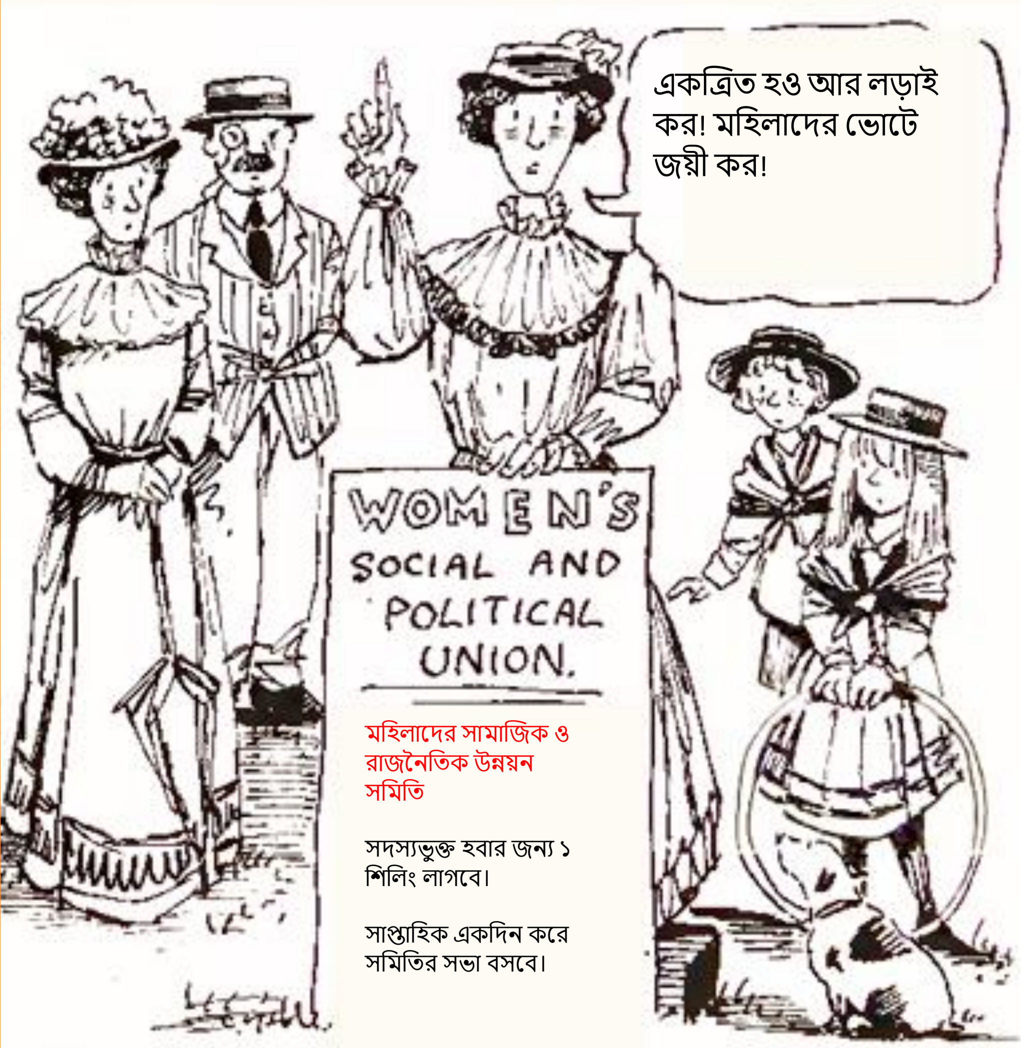
এবার এমিলাইন কাজ ছাড়া কিভাবে তাঁর পরিবারের দেখভাল করবেন! নতুন চাকরিতে ঢুকে এমিলাইন আরো ভালোভাবে বুঝতে পারলেন গরীবের জীবন কত কঠিন।



"কিছুই তো আমার হাতে নেই। সব বদলানো সম্ভব একমাত্র যদি আমরা সোচ্চার হই আর ভোটাধিকার পাই।" এমিলাইন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন কি করলে অবস্থার উন্নতি হবে......

এমিলাইন তাঁর মেয়ে ক্রিস্টাবেলের সাহায্যে এক সংগঠন তৈরী করলেন।

তিনি রাস্তার পাশে, পার্কে, ……এমন বহু জায়গায় বক্‌তৃতা দিতে শুরু করলেন।



সেসময় তিনটি মুখ্য রাজনৈতিক দল ছিল। এমিলাইন জানতেন যে আইন পরিবর্তন করতে গেলে তাদের সাহায্যই দরকার।

শ্রমিক সংগঠনের নেতা কের হার্ডি এগিয়ে এলেন, “আমি সাহায্য করতে পারি।“



আরেক সংস্থা এগিয়ে এল সাহায্যে।

“তোমরা, মুক্তিবাদীরা আমাদের ভোট দেবে?” ক্রিস্টাবেল জিজ্ঞাসা করল।

কিন্তু কেউ তার সাথে কথাও বলল না।

কিন্তু ক্রিস্টাবেল ছাড়ার পাত্রী নয় – এটা বিরাট খবর হয়ে যায়।



তিন দিন পর তিনি ছাড়া পেলেন। সেই সন্ধ্যের সভাই সবচেয়ে বড় সভা ছিল তখন পর্যন্ত।



এমিলাইন সব সদস্যদের বললেন, "লোকেদের নজর আমাদের কাড়তেই হবে! চেঁচাও! গোলমাল কর! ঝামেলা কর!”

"চেঁচাব? ঝামেলা করব? আমরা পারব!” তারা অবাক হয়ে জানতে চাইল।

“আমরা তো জানি না কিভাবে করতে হয়।“ এমিলাইন দেখালেন কিভাবে করতে হয়।



খুব শিগগিরিই সব নেতারা, যত বড় নেতাই হোন না কেন, নিজেদের গদি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।



কিন্তু শিগগিরিই পুলিসও বিক্ষোভকারী মহিলাদের গুলি করে ফেলতে লাগল।

এমিলাইন বললেন, “এরা তো আমাদের কিছু বলার আগেই মেরে ফেলছে। এবার থেকে তাহলে আমাদের ব্যানার আর পতাকা সরিয়ে ফেলতে হবে। মুখও ঢেকে নিলে ভাল। তাহলে কেউ বুঝতে বা চিনতে পারবে না। আর তাহলেই আক্রমন করা সুবিধা হবে!”

“এই মহিলারা কি অসভ্যতামি শুরু করেছে!”, নেতারা বলতে শুরু করলেন।

এমিলাইন প্রত্যুত্তরে বললেন, “একমাত্র এই রাস্তাই খোলা আছে আমাদের কাছে। সবার কাছে আমাদের কথা পৌঁছে দিতে হবে।“

দিন রাত এক করে তিনি পরিকল্পনা করতে লাগলেন।



এমিলাইন বললেন, “আমাদের প্রথম পদযাত্রা হবে পার্লামেন্ট হাউস পর্যন্ত।“

৪০০ মহিলা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাদের সামনে সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল, যাতে তারা ঢুকতে না পারেন।

মহিলা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন



"এরা আমাদের কিন্তু জেলেও পুরে দিতে পারে। কিন্তু আমরা থামব না। আমাদের লড়াই চলতেই থাকবে।“

এতে করে তাদের পথপ্রদর্শন আরো বেড়েই চলল।



এখন এমিলাইনের বয়স ৫০। কিন্তু এখন তিনি আগের চেয়েও অনেক বেশী ব্যস্ত।

“আমার সহকারী লাগবে এবার।“

কের হার্ডি বললেন, "আমি শুধু মানুষকেই বুঝি, আমার কাছে তারাই মুখ্য। তারা নিশ্চয়ই কিছু টাকা তোলার উপায় বার করবে।”



সময় খুব তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছিল। মহিলারা ডাক্তারিতে যোগদান করছিলেন।শুধু তাই নয়, তাঁরা উচ্চশিক্ষিত হয়ে আরও নানান গুরুত্বপুর্ণ কাজে যোগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু তবু ভোটাধিকার নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের নীরবতা মহিলাদের ধৈর্যের বাঁধ ধীরে ধীরে ভেঙে দিচ্ছিল।



প্রতিদিন নতুন নতুন মহিলারা এমিলাইনের সাথে যোগ দিতে লাগলেন।

তারা এমিলাইনকে বলতেন, “তোমায় দেখে আমরা মনে জোড় পাই। আমরা গর্ব বোধ করি। আমাদের বলুন কি ভাবে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি।“

মহিলাদের আওয়াজ ধীরে ধীরে আরও সঙঘবদ্ধ হতে লাগল। আরো জোড়ালো হতে লাগল। তার সাথে সাথে পুলিসও তাদের প্রতি আরও কঠোর হয়ে উঠতে লাগল।

আন্দোলনকারীরা প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির জানলা চুরমার করে দিল। এইভাবে তাদের প্রতিবাদ এক নতুন মোড় নিল।



কিছু মহিলা এবার আওয়াজ তুললেন, “বন্ধ কর! এভাবে মারামারি করা আর ভাঙচুর করা, চেঁচানো মহিলাস্বরুপ ব্যবহার নয়। মহিলারা অতিচালাকি করতে গেলে ফল ভাল হবে না। পুরুষেরা আমাদের বলুক কি করা উচিৎ।“

এমিলাইনের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ালেন, তাঁর গায়ে থুতু দিলেন, এবং তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলেও দিলেন।

বছরের পর বছর এইভাবে আন্দোলন করতে করতে তাঁর জমা পয়সা শেষ হয়ে এসেছিল।তাঁর চাকরীও চলে গেছিল। আর বারবার তাঁকে জেলেও যেতে হচ্ছিল।



কিন্তু কিছুই পরিবর্তন হয় নি।

“প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট চেষ্টা করছেন না। তিনি আসলে কিছুই করছেন না। আমাদের আবার বিক্ষোভ দেখানো উচিৎ।”

এমিলাইন আর ৪৫০ জন মহিলা পার্লামেন্টের দিকে পদযাত্রা করে এগিয়ে চললেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাদের দেখলেন না। এরপর যা হল তা ইতিহাসে ব্ল্যাক ফ্রাইডে বলে লেখা হয়ে থাকল।

এবং সেটা ঘটনাটার জন্য, শুধু শব্দের খাতিরে নয়।



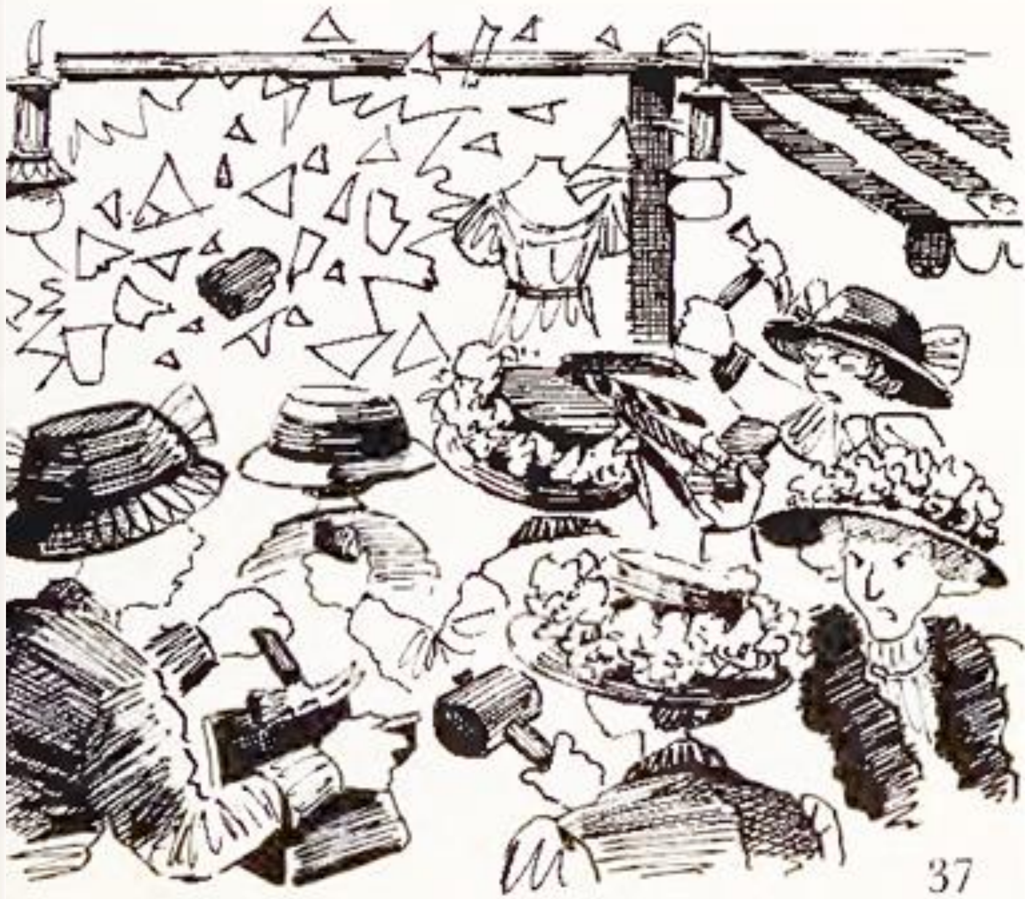
"আমরা ছাড়ব না!" এমিলাইন চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন।

নেতারা হতাশ হয়ে পড়লেন। রাজাও হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু ফল কিছুই হল না।



"ওদের সব জানলা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দাও! আমরা যে ক্ষুব্ধ, সেটা সবাইকে দেখাও!"

অবশেষে মার্চ মাসে একদিন ক্ষোভ জানাতে তারা লন্ডনের সবচেয়ে ব্যস্ত, জনবহুল বাজারের মধ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন............



বিশাল সংখ্যক মহিলা গ্রেফতার হয়ে জেলে গেলেন। এমিলাইনও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি এমন অনেকবার গ্রেফতার হয়েছিলেন, কিন্তু তা তাঁকে দমাতে পারে নি কখনো।

"সব ভেঙ্গে দাও! তছনছ করে দাও! চেঁচাও! জোড়ে!” এমিলাইন বললেন।

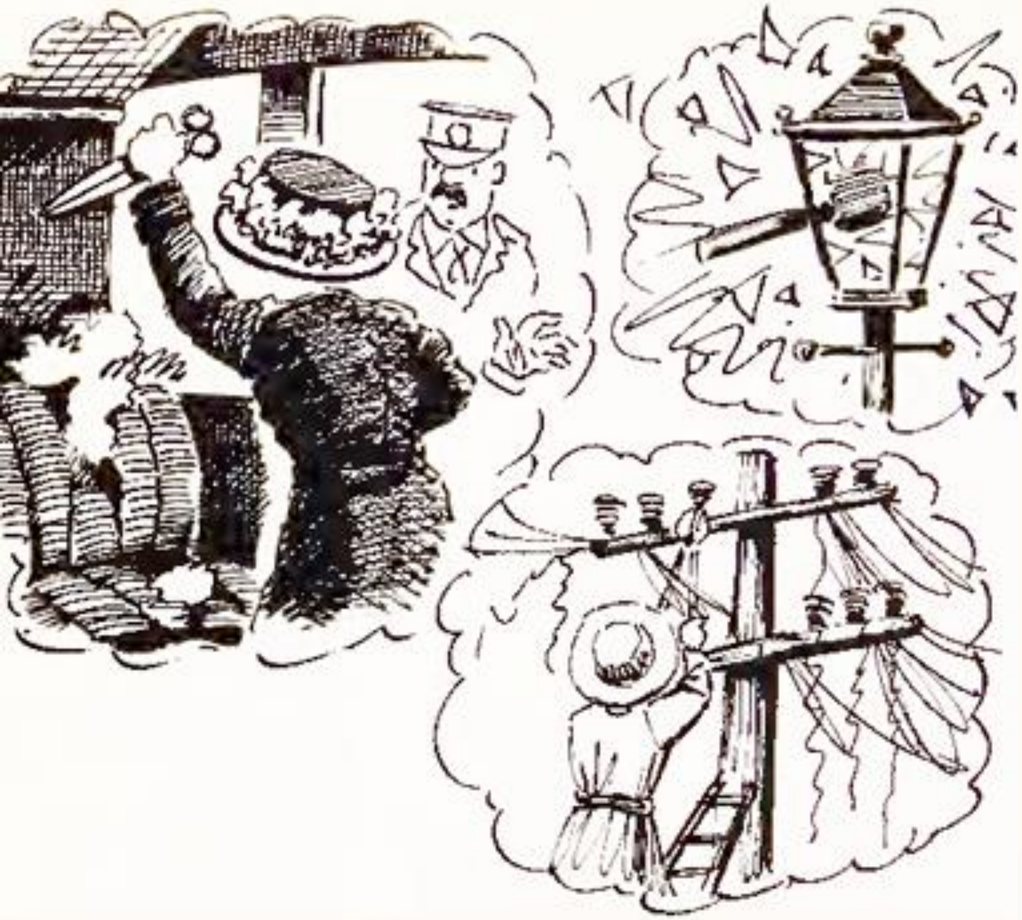
আর সব মহিলারা তাই করতে লাগলেন।



“আমরা কষ্ট করব। আমদের কাজ চলে যেতে পারে, ঘর ভেঙ্গে যেতে পারে, স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে। তবু আমরা আমরণ এমিলাইন প্যাংখুর্স্টের নির্দেশ মেনে আন্দোলন চালিয়ে যাব।“

মহিলাদের ভোট দাও।





"এত হিংসা চারিদিকে!” কেউ একজন বললেন।

"এটাই যথেষ্ঠ নয়। আমাদের আরও কিছু করতে হবে। পঞ্চাশ বছর ধরে মহিলারা শান্তিপূর্বক আন্দোলন চালিয়েছেন ভোটাধিকার পাবার জন্য। আর এখনো তারা সফল হন নি।“

আর তখনই ঘটল সেই দূর্ঘটনা।

এমিলি ডেভিসন নামে এক মহিলা একবার ভোটাধিকারের জন্য জনমত প্রদর্শনের জন্য এক বিখ্যাত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে গেছিলেন। কিন্তু একটা ঘোড়সওয়ার তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পিষে মেরে ফেলেছিল।



এমিলাইনের তখন ৫৫ বছর। তিনি তখন জেলে।

“আমাদের হয় ভোট দেবার অধিকার দাও, নয়ত আমরা সবাই মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত।“ তিনি বললেন আর এরপর খাওয়া ছেড়ে দিলেন। আর সমস্ত মহিলারা যাঁরা তাঁর সাথে জেলে ছিলেন, তাঁরাও একই সাথে অনশন করতে শুরু করলেন।

"জোড় করে খাওয়াও,” রাজা আদেশ দিলেন। আর সে এক বীভৎস, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হল।



তারা এমিলাইনকেও জোড় করে খাওয়াতে চেষ্টা করল- কিন্তু তিনি প্রতিরোধ করলেন।

যতবার তিনি মৃতপ্রায় হতেন, ততবার তারা তাঁকে ছেড়ে দিত। আবার তিনি ভাল হয়ে উঠলে তারা আবার তাঁকে জেলে পুরে দিত।



এভাবে চলতে চলতে এমিলাইন মৃত্যুমুখে এগিয়ে চললেন।

পরের বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল।

“আমাদের সাহায্য কর!” সব বন্দী মহিলদের মুক্ত করে নেতারা বললেন।

“মানুষজন তোমাদের কথা শোনে। ভোট থামাতে হবে। আমাদের এই যুদ্ধ ভোটের আগে জিততে হবে।” এমিলাইন বললেন।



“দারুন কাজ করেছ তোমরা।“ যদ্ধ জয়ের পর রাজনীতিকরা বললেন। ত্রিশোর্ধ মহিলারা ভোটাধিকার পেলেন।

আরও দশ বছর পর ২১ বছরের উপরে সব মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হল। অবশেষে এমিলাইন জয়ী হলেন।

আর ঠিক এর এক সপ্তাহ পর তিনি মারা গেলেন।



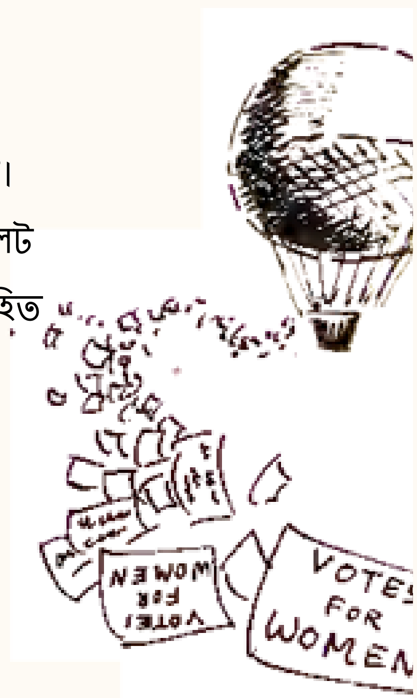
অতিরিক্ত

সুফ্রাগেটস

এমিলাইন এবং তাঁর অনুসরণকারীদের সাফ্রাগেটস বলা হত। এই শব্দটির উৎপত্তি ইংরাজী সাফ্রেজ শব্দ থেকে। সাফ্রেজ সব্দের অর্থ হল যাঁরা ভোট দিতে সক্ষম। আজ পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাই ১৮ বছর হলেই ভোট দিতে পারেন, কিন্তু এটা সফল হয়েছে এই সাফ্রেজদের জন্যই।

মহিলাদের ভোট

এমিলাইন সর্বদা নতুন কিছু করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইতেন। একবার সাফ্রেজরা বেলুন থেকে লিফলেট ফেলেছিলেন মানুষকে সচেতন ও অবহিত করার জন্য। একবার তারা নৌকায় চেপে বড় বড় চোঙায় ও মাইকে তাদের কথা প্রচার করেছিলেন।



কখনো তারা ফুটপাথের উপর চক দিয়ে তাদের দাবী ও অসন্তোষ জানাতেন তো কখনো বা স্যান্ডউইচ বোর্ড গায়ে জড়িয়ে পথপ্রদর্শন করতেন। একবার বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় তাঁরা সাপ লুডোর মত একটা বোর্ড গেমকেও থিম রেখেছিলেন। একটা কথা সেসময় খুব প্রচলিত ছিল যে সাফ্রেজরা শুধু জেলে ঢোকে আর বেরোয়।

পাথর ছোঁড়া

বিক্ষোভের সময় সাফ্রেজরা পাথর ছুঁড়তেন আর জানালা ভাঙচুর করতেন। কিন্তু লন্ডনে তো আর এত পাথর একসাথে পাওয়া সম্ভব ছিল না! তাই কিছু মহিলা আগের দিন রাতে শহর ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে যেতেন পাথর সংগ্রহ করার জন্য। এমিলাইনের নিক্ষেপ একদম ভাল ছিল না। তাই তিনি অনেক অভ্যেসের পরও ডাউনিং স্ট্রীটের বিক্ষোভে একটিও জানালা ভাঙতে সক্ষম হন নি।

এমিলাইন প্যাঙ্‌খুর্স্টের জীবনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তারিখ

১৮৫৮ এমিলাইন গোল্ডেনের জন্ম

১৮৭৯ এমিলাইন ও রিচার্ড প্যাঙ্‌খুর্স্টের বিবাহ

১৮৮০ এমিলাইনের কন্যা, ক্রিস্টাবেলের জন্ম

১৮৯৮ রিচার্ড প্যাঙ্‌খুর্স্ট মারা যান

১৯০৩ মহিলা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়

১৯০৬ পার্লামেন্ট হাউসের উদ্দেশ্যে প্রথম পদযাত্রা। এমিলাইন প্রথম বার জেলে যান।

১৯০৯ প্রথম বার সাফ্রাগেটরা অনশন ধর্মঘট করে।

১৯১০ পুলিসেরা বিক্ষোভকারীদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে যেদিনটা ব্ল্যাক ফ্রাইডে নামে পরিচিত।

১৯১২ মহিলাদের বিক্ষোভের ঝড়ে পশ্চিম লন্ডন কার্যতঃ অচল হয়ে যায়।

১৯১৩ এমিলি ডেভিসন মারা যান। এমিলাইন এক বছর ধরে কখনো জেলে কখনো জেলের বাইরে কাটান।

১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। ত্রিশোর্ধ মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

১৯২৮ একুশোর্ধ মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। এমিলাইন মারা যান।

সমাপ্ত